Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume –2, Issue-iii, published on July 2022, Page No. 362–371
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

রবীন্দ্র ছোটগল্পে পল্লীজীবন বনাম নাগরিক জীবন

শ্রুতকীর্তি সরকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : rosy2011.cu@gmail.com

Keyword
ছোটগল্প, উনিশ শতক, পল্লীজীবন, নাগরিক জীবন, মেঘ ও রৌদ্র, পোস্টমাস্টার, শহুরে যুবক, কুমু

Abstract
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নব সাহিত্য সংরূপ ছোটগল্পের আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্র প্রতিভার স্পর্শে এই সংরূপ অনন্য শিল্পরূপে উন্নীত হয়েছে। তিনি মূলত রোমান্টিক কবি। কিন্তু বাস্তব সচেতন ও সমাজ অভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ হয়েছে তাঁর রচিত ছোটগল্প গুলির মাধ্যমে। তাঁর ছোটগল্প নামক শিল্প সংরূপে ব্যঞ্জিত হয়েছে পল্লীজীবন ও নাগরিক জীবনের যথার্থ প্রতিচ্ছবি। সুখ ও দুঃখ, প্রেম ও বিরহ, আনন্দ ও বেদনা, অপমান ও আপ্যায়ন এর বিমিশ্র উপাখ্যানে ছোটগল্প গুলি যেন জীবন্ত আলেখ্য। তাঁর গল্পে নিঃসঙ্গ পল্লীপ্রকৃতিতে শহুরে যুবকের একাকীত্ব (পোস্টমাস্টার), ঘরে-বাইরে পরাজিত পল্লীর ব্যর্থ লেখক (তারাপ্রসন্নের কীর্তি), আত্মত্যাগী মহৎ প্রাণের সেবক (খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন) ইত্যাদি বিভিন্ন চরিত্রের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মী কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। গ্রাম থেকে শহর প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছিত হয় নারী। স্বামী কর্তৃক প্রবঞ্চিতা (প্রায়শ্চিত্ত, দৃষ্টিদান) বিন্ধ্যবাসিনী ও কুমু। কুমুর কাছে তার স্বামী ফিরে এলেও গল্পের শেষে স্বামীর কাছে প্রতারিত হয় বিন্ধ্যবাসিনী। নারীদের অন্তর্দাহর চিত্র যেমন বর্ণিত হয়েছে অনুরূপ পল্লীর প্রেক্ষাপটে অব্যক্ত প্রেমের অপূর্ণ কাহিনী আখ্যায়িত হয়েছে 'একরাত্রি' গল্পে। পল্লী ও নগরে বিচিত্র শ্রেণী, মানসিকতার, ধর্মের মানুষের বসবাস। তাদের চেতনা, চাহিদা, জীবনচর্যা বিচিত্রমুখী। কেউ জীবন যুদ্ধে হার মেনেছে তো আবার কেউ কঠিন সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। বাংলার ভিত্তিভূমি হল পল্লীকেন্দ্রিক সমাজ। বিশ শতক থেকেই পল্লী সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নাগরিক সংস্কৃতি। নাগরিক জীবনের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে পল্লীর সহজ সরল মানুষ দিকহারা নাবিকের মত দিকভ্রষ্ট হয়ে পুনরায় গ্রামে ফিরে এসেছে, আবার কখনো নাগরিক জীবনের জটিলার্বতে নিজের আত্মবলিদান দিয়েছে (রাসমণির ছেলে, ছুটি)। সুভা ও ফটিক পল্লীপ্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত। এই দুই মুক্তপ্রাণ পল্লীর থেকে ছিন্ন হয়ে বদ্ধ জীবনের কাছে পরাজিত হয়েছে। পল্লীতে স্নিগ্ধতার পাশাপাশি সহাবস্থান করে গ্রামীণ দলাদলি, সংকীর্নতা ও পল্লীর স্বার্থান্বেষী রাজনীতি। যেখানে প্রতিমুহূর্তে হেনস্থার শিকার হতে হয় শশিভূষণের মত (মেঘ ও রৌদ্র) শহরের শিক্ষিত যুবককে। সে প্রতিবাদী, সত্যের পথে চলা আদর্শ পথিক। কিন্তু সেই সত্য আজ মিথ্যার বেড়াজালে আবদ্ধ। সেইজন্য শশিভূষণ জেল খাটে, সত্য পরাজিত হয় মিথ্যার কাছে। রবীন্দ্রনাথ মানবদরদী লেখক। তাঁর ছোটগল্প গুলি যেন মানুষের জীবনের ছোট ছোট দুঃখ,বেদনা,আশা, আকাঙ্ক্ষার বিষম উপলব্ধির পরিব্যপ্ত

রূপের চিত্রায়ন। মানুষের জীবন কাহিনী ব্যক্ত করবার উদ্দেশেই হয়তো তিনি কখনো পল্লীজীবন আবার কখনো নাগরিক জীবনকে প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্যবহৃত করেছেন। তারফলেই দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করে তিনি হয়ে উঠেছেন যথার্থ মানবশিল্পী।

Discussion

বাঙালি মানসের চিরন্তন সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঙালি জীবন,সংস্কৃতি ও প্রকৃতির যথার্থ প্রতিচ্ছবি বারংবার অঙ্কিত হয়েছে তাঁর কাব্য-নাটক-উপন্যাস-প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ মূলত রোমান্টিক কবি। তাঁর রোমান্স চেতনা সর্বদা 'বলাকা'র পাখায় উড্ডীয়মান হয়ে অনন্তের পথে 'নিরুদ্দেশ' যাত্রা করেছে। সেই অনন্ত যাত্রার অন্তহীন অপার্থিব ও লোকাতীত সৌন্দর্য আমাদের মনকে সহজেই দ্রবীভূত করে। কিন্তু এই চিরপরিচিত রোমান্টিক কবি কে আমরা নবরূপে দেখতে পাই তাঁর রচিত ছোটগল্পে। বাস্তব সচেতন ও সমাজ অভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে তাঁর ছোটগল্পের মাধ্যমে। ছোট ছোট সুখ-দুখ-ব্যথা-বেদনা-আনন্দ এর সংমিশ্রণে ছোটগল্প গুলি অনবদ্য শিল্প সংরূপে পরিণতি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সোনার তরী কাব্যে বর্ষাযাপন কবিতায় বলেছেন-

"ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতির রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।।"[১]

প্রকৃতপক্ষে ছোটগল্প আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম শিল্প সংরূপ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে এই সংরূপের প্রথম প্রকাশ। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট এই নব সাহিত্য সংরূপ রবীন্দ্রনাথের লেখনীর দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করে। সেক্ষেত্রে বলা যেতেই পারে বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংক্ষিপ্ত পরিসরে জীবনের খণ্ড-বাস্তবকে চকিতে আলোকিত করে তোলা ছোটগল্পের কাজ। ছোটগল্পের সূচনা হয় কিছুটা আকস্মিক এবং তা দ্রুত পরিণতি তে পৌছে হঠাৎ শেষ হয়। রবীন্দ্রনাথের 'শেষ হয়ে হইল না শেষ' এর আকস্মিকতা যেমন গল্পের শুরুতে তেমনি শেষেও। প্রেম-বিরহ, জীবন-মৃত্যু, অপমান-আপ্যায়নের বিষম ব্যঞ্জনায় গল্পগুলি হয়ে উঠেছে অনন্য শিল্প। এই আখ্যান গুলিতে মানুষের অন্তর্দাহ,অন্তহীন বেদনা ও আশা-আখাঙ্খার পরিব্যাপ্ত সত্যের উপলব্ধি আনয়ন করেছেন জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ।

বাংলার ভিত্তিভূমি পল্লীকেন্দ্রিক সভ্যতা। উনিশ শতকের নবজাগরণের পুণ্য স্পর্শে বাংলায় নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ হয়। সেইসময় নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল শহর কলকাতা। রবীন্দ্রনাথের জন্ম কলকাতার ঠাকুর বাড়ির অভিজাত বংশে। স্বভাবতই তাঁর গল্পে শহর কলকাতা নাগরিক জীবনচর্যা বারংবার উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু পল্লীজীবন ব্রাত্য নয়। বরং ছোটগল্প গুলি পল্লীজীবনের জীবন্ত আলেখ্য। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

> "আমার রচনায় যারা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পাননি বলে নালিশ করেন তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এলো। একসময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস, এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকতায় প্রকাশ হয়নি।"[২]

নাগরিক জীবন ও পল্লীজীবনের যাঁতাকলে আবদ্ধ বেদনার্ত ও আমোদিত মানুষের কাহিনীই তাঁর গল্পের প্রধান উপজীব্য বিষয়।

প্রথমেই বলা যাক 'পোস্টমাস্টার' (হিতবাদী, ১২৯৮) গল্পের কথা। গল্পের সূচনায় লেখক বলেছেন-

> "আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যেরকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্য আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস; অদূরে একটা পানাপুকুর এবং তাহার চারি পাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।"[৩]

একটি অতি সাধারণ পল্লীজীবন। যেখানে চাকরি সূত্রে পোস্টমাস্টারের আগমন। কবিকল্পনার পল্লী-প্রকৃতি থেকে এর জাত ভিন্ন। নিঃসঙ্গ পোস্টমাস্টারের একমাত্র সঙ্গী রতন নামক বারো-তেরো বছরের কিশোরী। রতনের সাথে পোস্টমাস্টারের সখ্যতা গড়ে ওঠে। বাস্তবের পল্লীজীবনের গদ্যময়তায় রতন-পোস্টমাস্টারের বন্ধুত্ব যেন পদ্যের ঝঙ্কার তোলে। রতন অনাথা, গ্রামবাংলার পিতৃমাতৃহীন মেয়ে। উপযুক্ত বয়েস হলেও-

> "বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।"[৪]

স্নেহভিখারী রতন পোস্টমাস্টারের স্নেহসান্নিধ্যে আপ্লুত। নিঃসঙ্গ 'দাদাবাবু'র অলস সময়ের সঙ্গিনী রতন। এই বন্ধুত্ব, পোস্টমাস্টারের কাছে যা ছিল সাময়িক সুখ রতনের কাছে তা হয়ে উঠেছিল সামগ্রিক জীবনের অনন্ত সুখ। রতন কখনো তার 'দাদাবাবুর' ছাত্রী, আবার কখনো সেবিকা, কখনো নিঃসঙ্গতার সঙ্গিনী। পল্লীজীবনের সরলতার সাথে সম্পৃক্ত তাদের এই সরল বন্ধুত্ব। কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন। এই গল্পে পল্লীজীবনের রূঢ় বাস্তব রূপটি বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ। পোস্টমাস্টার বদলি হয়ে পুনরায় কলকাতায় ফিরে যায়। ছিন্ন হয় রতন-পোস্টমাস্টারের বন্ধুত্ব। আসলে পোস্টমাস্টার পল্লীজীবনের সাথে সহজ ভাবে মানিয়ে নিতে পারেনি। সে মুক্তি পেতে চায় এই পল্লীজীবন থেকে-

> "কখনো কখনো দুটো একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়– কিন্তু অন্তর্যামী জানেন ,যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাতের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলো কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।"[৫]

স্নিগ্ধ প্রকৃতি অপেক্ষা ইট-কাঠ-পাথরের নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতা তাকে বেশি আকৃষ্ট করে। নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা তাকেও করে তুলেছে যান্ত্রিক। তাই সে অনায়াসে পল্লীজীবন তথা রতন কে ত্যাগ করে। রতন প্রকৃতপক্ষে স্নেহময় পল্লীপ্রকৃতির প্রতীক। যে স্নেহ মায়া বন্ধনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে আবদ্ধ করতে চাই। আর স্নেহহীন পোস্টমাস্টাররা সেই মায়ার নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে, যাত্রা করে ভবিষ্যতের দিকে।

> "একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'– কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।"[৬]

কিন্তু রতন— "...মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়।"[৭]
গল্পের শেষে নাগরিক জীবনের প্রতিভূ পোস্টমাস্টারের নির্দয়তা আমাদের মনকে হতাশ করে।

'তারাপ্রসন্নর কীর্তি' (হিতবাদী, ১২৯৮) গল্পটি একজন সামাজিক-সাংসারিক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অসফল ব্যক্তির কাহিনী। সেই ব্যক্তিটি হল তারাপ্রসন্ন। তারাপ্রসন্নের চরিত্র পল্লীসমাজ ও নাগরিক সমাজের দ্বৈত প্রেক্ষাপটে বিবৃত হয়েছে। তারাপ্রসন্ন গুপ্ত লেখক। তার সৃজন প্রতিভা গুপ্ত থাকার কারণ -

> "লেখকজাতির প্রকৃতি অনুসারে তারাপ্রসন্ন কিছু লাজুক ও মুখচোরা ছিলেন। লোকের কাছে বাহির হইতে গেলে তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত হইত। ঘরে বসিয়া কলম চালাইয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, পিঠ একটু কুঁজা, সংসারের অভিজ্ঞতা অতি অল্প। লৌকিকতার বাঁধি বোল-সকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না, এইজন্য গৃহদুর্গের বাহিরে তিনি আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ মনে করিতেন না।"[৮]

সংসারী হয়েও সে সংসার বিমুখ। অন্যদিকে স্ত্রী দাক্ষায়ণী পল্লীর সাধারণ গৃহবধূ। সে স্বামীর সাহিত্যচর্চা একমাত্র গুণগ্রাহী ভক্ত। তাঁর মতে-

> "...বিদ্যাবুদ্ধি-ক্ষমতায় তাঁহার স্বামীর সমতুল্য কেহ নায় এবং সে কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না;"[৯]

সংসারের নিত্য অভাব ও অন্যদিকে কন্যাদের বিবাহের জন্য সদাচিন্তিত দাক্ষায়ণীর উপদেশে তারাপ্রসন্ন কলকাতা যাত্রা করে। লক্ষ্য ছিল নিজ বিরচিরচিত গ্রন্থ বিক্রি করে অর্থ-উপার্জন করা। পল্লীর সহজ-সরল দম্পতি অজ্ঞাত ছিল নাগরিক জীবন সম্পর্কে।

> "কলিকাতায় আসিয়া তারাপ্রসন্ন চতুর সঙ্গীর সাহায্যে 'বেদান্তপ্রভাকর' প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যে ক'টি পাইয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়া গেল—"[১০]

বই প্রকাশ হয়, তার সাথে সাথে বই এর সমালোচনা বেশি প্রকাশিত হতে থাকে। ব্যর্থ লেখক সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরে যায় তাঁর পল্লীগৃহে। দাক্ষায়ণী স্বামীর পরাজয় মেনে নিতে পারে না,

> "অবশেষে দাক্ষায়ণী যখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন তখন পৃথিবীর সাধুতা সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত বিশ্বাস বিপর্যস্ত হইয়া গেল। নিশ্চয় দোকানদারেরা তাঁহার স্বমীকে ঠকাইয়াছে এবং বাংলাদেশের সমস্ত ক্রেতা ষড়যন্ত্র করিয়া দোকান্দারকে ঠকাইয়াছে।"[১১]

সে নারী, আদর্শ স্ত্রী; আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়ে পঞ্চম কন্যা 'বেদান্তপ্রভা'র জন্ম দেয় এবং স্বামীর প্রতিভার মান রক্ষা করে। এই গল্পে ঘরে-বাইরে ব্যর্থ তারাপ্রসন্ন একটি ট্র্যাজিক চরিত্র।

'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' (সাধনা, ১২৯৮) এ এক গ্রাম্য সরল ভৃত্য কে দেখি, যার নাম রাইচরণ। রাইচরণ প্রভুভক্ত, যেন গ্রাম ও শহরের সে চিরন্তন ভৃত্য। যে ভৃত্য প্রভুর জন্য তার যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে। গল্পে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। যে পরিবারের ভৃত্য রাইচরণ।

> "রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো।যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর-বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন কার্যে সহায়তা তাহার প্রধান কার্য ছিল।"[১২]

রাইচরণের আত্মা সরল, সে চরিত্রে স্নেহপ্রবণ, আদর্শে অতিবিশ্বাসী ভৃত্য। পল্লীর গতানুগতিক ধারায় বহমান ছিল রাইচরণ ও তার প্রভুর জীবন। প্রথমে অনুকূল ও পরে অনুকূল পুত্র 'খোকাবাবু'র দেখভালের দ্বায়িত্ব নেয় রায়চরণ। গল্পে নদী র কথা আছে, পদ্মা নদী। পদ্মা নদী এখানে মৃত্যু স্বরূপা। এই নদীগর্ভে হারিয়ে যায় অনুকূলের শিশুপুত্র।

> "কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছলছল খলখল করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।"[১৩]

প্রকৃতি গ্রাস করে শিশুকে আর সকলের নিকট দোষী সাব্যস্ত হয় রাইচরণ।

> "এবং মাঠাকুরাণীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে...।"[১৪]

সম্ভ্রান্ত পরিবার হলেও গ্রামীণ সংকীর্ণতা অতিক্রম করতে পারেনি অনুকূল বাবুরা; যে চিরবিশ্বাসী সেই রাইচরণ হয়ে ওঠে অবিশ্বাসী। কাজ হারিয়ে দেশে ফিরে যায় রাইচরণ এবং বৃদ্ধ বয়সে মাতৃহারা পুত্র ফেলনার দায়িত্ব নেয়। 'খোকাবাবু' তার গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে এই অন্ধবিশ্বাসে ভৃত্যের ন্যায় পরম যত্নে ফেলনার প্রতিপালন করে, সেইজন্য সে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে আসে। আপন সামর্থ্য অতিরিক্ত অশন, বসন ও ভূষণে তার ফেলনারূপী 'খোকাবাবুর' প্রতিপালন করে। বারো বছরের ফেলনা অনুকূল বাবুর গৃহে 'খোকাবাবু' হিসাবে প্রত্যাবর্তন করে। আর ক্লান্ত, বৃদ্ধ, পল্লীর চিরন্তন ভৃত্য নিরুদ্দেশ হয়, আর পাঠকের মনে রেখে যায় তার মহৎ চরিত্রের জন্য অনেক ভালবাসা। অনদিকে 'একরাত্রি' (সাধনা, ১২৯৯) গল্প যা নিতান্ত একটি প্রেমের গল্প, পল্লীপ্রকৃতির পেক্ষাপটে হয়ে উঠেছে অনন্যসাধারণ। গল্পের নায়ক ও সুরবালার প্রেমের সূত্রপাত বাল্যকালে। সে সময় তাদের মনে প্রেম ছিল সুপ্ত—

> "সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বৌ বৌ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড়ো যত্ন করিতেন আমাদের দুজনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন 'আহা দুটিতে বেশ মানায়'।"[১৫]

সেইসময়ের গতানুগতিক পল্লীজীবন বর্ণিত হয়েছে, ছোটো বয়সে পাঠশালায় পড়াশোনা, একটু বড় হলে জমিদারের সেরেস্তায় কাজ, বিবাহ ও সংসার জীবন। গল্পের নায়ক চেয়েছিল এক ব্যতিক্রমী জীবন, যে জীবনে সম্মান ও প্রতিপত্তি বেশি। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বশবর্তী হয়ে নায়ক ত্যাগ করে পল্লীজীবন তথা বাল্যসঙ্গী সুরবালাকে।

> "আমিও নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া এক সময় বিশেষ সুবিধাযোগে কলিকাতায় পালাইয়া গেলাম।"[১৬]

নিয়তির পরিহাসে নায়ক সেকেন্ড মাস্টারের চাকরী পায়। পুনরায় সুরবালার সংস্পর্শে আসে সে, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে আজ সে পরস্ত্রী। উকিল রামলোচনের স্ত্রী। হারিয়ে গেছে বাল্য সময়ের সখ্যতা।

> "সন্ধ্যেবেলায় একটু স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইলো কেন। মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে সুরবালা কোথায় গেল।"[১৭]

একসময়ে নাজির হবার মোহে যে প্রেমকে উপেক্ষা করেছিলো সেই প্রেম আর ফিরে আসেনি। নায়ক বলেছেন-

> "ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারো মনে পড়ে না, তাহার পরে বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।"[১৮]

এই অস্থির হৃদয় এক ঝড়-ঝঞ্ঝার রাতে সুরবালা ও নায়কের নির্বাক মনোমিলনে শান্তি লাভ করেছে। গল্পের শেষে পল্লীর দুই বালক-বালিকার পবিত্র প্রেম যেন নাগরিক প্রতিপত্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করেও শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। 'ছুটি' ও 'সুভা' (সাধনা, ১২৯৯) গল্পদ্বয় পল্লীজীবন এবং নাগরিক জীবনের বৈষম্যকে পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত করেছে। ফটিক (ছুটি) ও সুভা পল্লীপ্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত। যেরূপ গাছের শিকড় মাটিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, ফটিক ও সুভাও সেইরূপ বাঁচতে চেয়েছিল। ছুটি গল্পে লেখক বলেছেন—

> "বালকদিগের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নতুন ভাবোদয় হইল; নদীর ধারে একট প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়া ছিল; স্থির হইল সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।"[১৯]

পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে বড় হওয়া ফটিক সহজপ্রাণ বালক। অন্যদিকে সুভার বর্ণনায়—

> "মুখের ভাব বৈ আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর – অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি।"[২০]

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মুক্তপ্রাণের কবি। তাঁর কবিতা-নাটক-উপন্যাস-ছোটগল্পে সেই মুক্তমনের জয়গান সর্বদা গীত হয়েছে। ফটিক মামার সাথে অতি উৎসাহের সাথে কলকাতা যাত্রা করেছে—

> " 'কবে যাবে' 'কখন যাবে' করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে রাত্রে তাহার নিদ্রা হয় না।"[২১]

আসলে সে অপরিণত অন্যদিকে সুভা পরিণত। জল ছাড়া মাছ যেমন বাঁচেনা, তেমনি সুভা জানত পল্লীবিচ্ছিন্ন তার জীবন মৃত্যুসম বেদনা দায়ক। কিন্তু সে মূক, প্রকৃতির মত অব্যক্ত। তার ভাষাহীন হৃদয়কে অনুভব করতে পারেনি তার নিজের মা-বাবা। বিবাহযোগ্যা সুভার বিবাহ উদ্দেশ্যে বাবা-মা সুভা নিয়ে কলকাতা যাত্রা করে। সামাজিক মর্যাদা রক্ষার্থে সুভার বাবা-মা সুভার বিবাহ দিয়ে কন্যাদায় থেকে মুক্তি পায়। এদিকে ফটিক কলকাতায় আসে; স্নেহহীন মামী ও কঠোর নিয়মের জালে বদ্ধ তার ওষ্ঠাগত প্রাণ ছুটি চেয়েছে। সে ফিরে পেতে চেয়েছে পল্লীমায়ের নিরাপদ আশ্রয়, আপন মায়ের স্নেহপরশ। যেমন চেয়েছিল বৈবাহিক জীবনে অসুখী সুভা

> "...যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, 'তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা। আমার মত দুই বাহু বাড়াইয়া তুমি আমাকে ধরিয়া রাখো'।"[২২]

এই দুই গল্পে পল্লীজীবন বিচ্যুত নাগরিক জীবনে পদার্পিত এক নারী ও এক বালকের জীবন ব্যর্থ হয়েছে। মুক্ত জীবন বদ্ধ জীবনের কাছে বন্দী হয়ে পরাজয় স্বীকার করেছে।

আকারে বড়ো 'মেঘ ও রৌদ্র' (সাধনা, ১৩০১) গল্পটি গ্রামীণ রাজনীতির নিখুঁত আখ্যান। এই গল্পের প্রানবিন্দু গিরিবালা ও শশিভূষণ। কলকাতার উচ্চশিক্ষিত শশিভূষণ তিলকুচি গ্রামে আসে তাদের বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। পাঠচর্চা এবং গিরিবালা নিয়ে তার জগৎ।

> "গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্যচর্চা করিত কেবল শশিভূষণ আর গিরিবালা।"[২৩]

সে যুগের পল্লীর স্বাভাবিক চিত্র, জমিদার বা ইংরেজ সাহেবের গোলামি করা এবং মুখ বুজে সব অন্যায় সহ্য করা। কিছু স্বার্থাণ্বেষী মানুষ নিজ আখের গোছাতে অন্যায়ের সাথে আপোষ করে, বিসর্জন দেয় মনুষত্ব এবং বিবেক- এই বিশেষ শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে গিরিবালার পিতা হরকুমার। শশিভূষণ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, অত্যাচারিত ও দুর্বল মানুষের সাহায্য করতে সে ভালোবাসে। এর ফলস্বরূপ বারংবার অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং পরাজিত হয় সে। নির্বান্ধব শশিভূষণ এর সখী গিরিবালাও ক্রমে দূরে দূরে সরে যায়। সমাজস্রোতের প্রতিকূলে ভাসমান শশিভূষণরা হার স্বীকার করে কিন্তু সত্য এবং ন্যায়ের প্রতি অটল থাকে। এজন্য জেল খাটতেও পিছপা হয়না –

> "তাঁহার বাপ আপিল করিতে উদ্যত হইলে শশিভূষণ বারংবার নিষেধ করিলেন; কহিলেন, 'জেল ভালো। লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া বিপদে ফেলে। আর যদি সৎসঙ্গের কথা বল তো, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন কাপুরুষের সংখ্যা অল্প, কারণ স্থান পরিমিত– বাহিরে অনেক বেশি'।"[২৪]

গল্পের শেষে তার ভাব-সঙ্গিনী গিরিবালার সাথে মিলন হয়। পল্লীর নিষ্ঠুর রাজনীতির ফলবশতঃ সাময়িক বিচ্ছেদ হয় তাদের। পরবর্তীকালে কলকাতায় জেল ফেরত শশিভূষণ বিধবা গিরিবালার কাছে তার প্রাণের আরাম, মনের আরাম পুনর্লাভ করে। এরপরে 'প্রায়শ্চিত্ত' (সাধনা, ১৩০১) গল্পে অসহায়, নিপীড়িতা ও অপমানিতা বিন্ধ্যবাসিনীর আখ্যান পাই। নারীনিগ্রহ এই গল্পের প্রধান বিষয় বস্তু। নায়ক অনাথবন্ধু উনিশ শতকের কলকাতার নব্য যুবক, ধনী গৃহের জামাই। স্বভাবে অকর্মণ্য অনাথবন্ধু শ্বশুর ঘরে বিলাসিতায় দিন যাপন করে। তৎকালীন কলকাতার নাগরিক জীবনের দ্বৈত চিত্র বিবৃত হয়েছে– একদিকে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী লাভ করে একদল নবীন যুবক নিজেদের নবভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে

চায়ছে, অন্যদিকে অনাথবন্ধুর মত নব যুবকরা পরধনে ভোগী ভোগসর্বস্ব জীবনকে অনায়াসে নির্বাচন করছে। অনাথবন্ধু স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীকে মন থেকে পছন্দ করে না–

> "স্ত্রীর নামটি অনাথবন্ধু পছন্দ করেন নাই এবং স্ত্রীটিকেও রূপে গুণে তিনি আপন যোগ্য জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর মনে স্বামীসৌভাগ্যগর্বের সীমা ছিল না।"[২৫]

বিন্ধ্যবাসিনী মানী নারী, সে চেয়েছিল স্বামীর পরিচয়ে যথার্থ সম্মানের সাথে বাঁচতে। নাগরিক জীবনের সমস্ত বিলাসিতাকে এক মুহূর্তে ত্যাগ করে শ্বশুরবাড়ির গ্রামে গিয়ে বসবাস করতে থাকে–

> "কলিকাতার ধনীগৃহে এবং পল্লীগ্রামের গৃহস্থঘরে বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু, বিন্ধ্যবাসিনী এক দিনের জন্যও ভাবে অথবা আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। প্রফুল্লচিত্তে গৃহকার্যে শাশুড়ির সহায়তা করিতে লাগিল।"[২৬]

অনাথবন্ধু পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি, সে অনুভূতিহীন, প্রেমহীন, যার কর্তব্য অপেক্ষা আপন স্বার্থসিদ্ধি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে শাশুড়ীর গহনা চুরি করা, গহনা বিক্রির টাকায় বিলাতে গিয়ে বিলাসিত জীবন, মা ও স্ত্রী কে নির্বিকারে ভুলে থাকা, মেম বৌ বিবাহ, পরে প্রায়শ্চিত্ত করে শ্বশুরের সম্পত্তির লাভের জন্য নির্লজ্জ চেষ্টা—প্রভৃতি ঘটনা পরম্পরা এক ভণ্ড পুরুষের নগ্ন রূপ প্রতিভাস হয়েছে। নগর থেকে পল্লীর সর্বত্র লাঞ্ছিত নারীর করুণ পরিণতি সে যুগের নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করে।

এই প্রসঙ্গে দৃষ্টিদান (ভারতী, ১৩০৫) গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানেও নারী লাঞ্ছনার শিকার। এই গল্পের নায়িকা দৃষ্টিহীন। দৈহিক অন্ধত্বের থেকে মানসিক অন্ধত্ব এই গল্পের মূল বিষয়বস্তু। শহরের বসবাসকারী এক সুখী দম্পতি। নায়িকা কুমু চৌদ্দ বছর বয়সে মৃত সন্তান প্রসব করে এবং তার সাথে নিজের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়। ইংরেজ সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের আচার-আচরণ-শিক্ষা-সংস্কৃতি তে পরিবর্তন হলেও অবস্থান পরিবর্তন হয়না নারীদের। সতীদাহ প্রথা বন্ধ হলে কুমুর মত মেয়েদের প্রতি মুহূর্তে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়। কুমুর চোখের চিকিৎসা প্রথমে তার স্বামীর করে,

> "তিনি নিজেই আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।"[২৭]

সেই চিকিৎসা নিয়ে স্বামীর আর কুমুর দাদার মধ্যে শুরু হয় অধিকারের দ্বন্দ্ব। নারীরা চিরকাল পরাধীন। অথচ সে মমতাময়ী, পারেনা নিজের দাদাকে কষ্ট দিতে আবার স্বামীর মনোঃক্ষুণ্ণ করতে,

> "...সহজেই আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, আমার জলের ধারা আরো বাড়িয়া উঠিল; তাহার প্রকৃত কারণ আমার স্বামীর কিংবা দাদা কেহই তখন বুঝিলেন না।"[২৮]

দ্বৈত চিকিৎসার ফলশ্রুতি, কুমু দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলে তবু এই আশা নিয়ে বাঁচে স্বামীর তার পাশে আছে। এই ধারণা মিথ্যায় পরিণত হয় হেমাঙ্গিনীর আগমনে। চাকরী সূত্রে কুমু তার স্বামীর সাথে মফঃস্বলে আসে এবং স্বামীর প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞাত হয়, পাঁড়া গাঁ র চিরপরিচিত সমাজ তাকে কঠোর সত্যের সন্মুখীন করে। অজ্ঞানতা থেকে দৃষ্টিলাভ করে কুমু। গল্পের শেষে কুমুর স্বামী কুমুর কাছে ফিরে এসেছে যদিও তা সম্ভব হয়েছে হেমাঙ্গিনীর মহানুভাবে। কুমু অসহায় নারী হলেও সে পুরাতন আদর্শের সতী লক্ষ্মী নয়। সে প্রতিবাদী, স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ সে সমর্থন করেনি বরং নিজের বৈধব্য কামনা করেছে। পুরাতন সতীলক্ষীর 'ট্যাবু' ভেঙ্গে সে হয়ে উঠেছে আধুনিক নারী। 'শুভদৃষ্টি' (১৩০৭, বঙ্গাব্দ) গল্পে ব্যঞ্জিত হয়েছে রূপ-গুণের দ্বন্দ্ব। নায়ক 'কান্তিচন্দ্র' আধুনিক যুবক—

> "দীর্ঘ কৃশ কঠিন লঘু শরীর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অব্যর্থ লক্ষ্য সাজসজ্জায় পশ্চিমদেশীর মতো; ..."[২৯]

সে শিকার করতে ভালোবাসে, বন্ধুদের সাথে পাখি শিকারে যায়। সেখানেই সে দেখতে পায় 'পাগলি' কে। নারী ও প্রকৃতি পরস্পর সম্পৃক্ত। প্রকৃতি কন্যা পাগলির রূপে মুগ্ধ হয় নায়ক কান্তিচন্দ্র। কিন্তু ভুলবশতঃ নবীন কন্যা সুধার

সাথে তার বিবাহ ঠিক হয়। সুধা ব্রাম্ভন কন্যা, নবীন বাবুর বিবাহযোগ্যা কন্যা। তৎকালীন পল্লীসমাজের কন্যাদায় গ্রস্ত পিতার চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে, সম্ভ্রান্ত পরিবারে মেয়ের বিবাহ প্রস্তাবে আপ্লুত হয়ে সে বলে-

> "নবীন গদগদকণ্ঠে কহিলেন, 'আমার সুধা বড়ো সুশীলা মেয়ে, রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজে অদ্বিতীয়'।"[৩০]

বিবাহের শুভদৃষ্টি তে গল্পের মূল চমক। সুধা নবীনপকন্যা হলেও সে কান্তিচন্দ্রের পছন্দের পাত্রী নয়। কান্তিচন্দ্রের পছদের পাত্রী পাগলি রূপ থাকলে ও সে বোবা-কালা আর রূপহীন সুধা কালো কিন্তু সে লক্ষীমন্ত কন্যা। গল্পের শেষে কান্তিচন্দ্র গুণবতী সুধাকে স্ত্রী হিসেবে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন।

গ্রামে সম্পত্তি জনিত সমস্যা, দ্ররিদ্র পিতা-মাতার স্বপ্ন পূরণে সন্তানের আত্মনিয়োগ, নাগরিক জীবনের চোরাস্রোতে পল্লীরত সরল যুবকের মৃত্যুর সম্বন্বিত ঘটনাবলী দেখতয়ে পাই 'রাসমণির ছেলে' (১৩১৮, বঙ্গাব্দ) গল্পে। ঘটনাচক্রে দরিদ্র যুবকের ব্যর্থ লড়াই এর কাহিনী আখ্যায়িত হয়েছে। আপনজনের কাছে প্রতারিত হয় কালীপদর বাবা ও ঠাকুমা –

> "শ্যামাচরণ অন্যায় করিয়া কর্তার উইল চুরি করিয়া ভাইকে বঞ্চিত করিল এবং পিতার বিশ্বাসভঙ্গ করিল..."[৩১]

পল্লীর নোংরা কূটনীতি, তঞ্চকতার মাধ্যমে পরের সম্পত্তি আত্মস্থ করা। হেরে যায় সরল, বিশ্বাসী ভবানীচরণ। পরাজিত -লাঞ্ছিত পিতা ভবানীচরণ আপন অপূর্ণ স্বপ্ন সফল করতে চায় পুত্র কালীনাথের মাধ্যমে-

> "ছেলের কোষ্ঠীতেও দেখা গেল, গ্রহে নক্ষত্রে এমনিভাবে যোগাযোগ ঘটিয়াছে যে হৃতসম্পত্তি উদ্ধার না হইয়া যায় না।"[৩২]

কিন্তু মা রাসমণি বিদ্যা-জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ এক আদর্শ মানুষ রূপে দেখতে চায় কালীনাথ কে, যে পরনির্ভর নয় বরং আত্মমর্যাদায় পরিপূর্ণ দ্বায়িত্ববান পুরুষ। পল্লীর ব্যতিক্রমী নারী রাসমণি, সংসারের কর্ত্রী সে, ভবানীর মত সম্পত্তি উদ্ধারের মিথ্যা ভাবুলতায় সে দিন যাপন করেনা। সে হিসেবী, তার কাছে মনুষ্যত্ব, আত্মমর্যাদা ও দায়িত্ব, এই তিন বেঁচে থাকার মূল মন্ত্র। এরপর কালীনাথ কলকাতায় উচ্চশিক্ষার রওনা হয় সে, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে মেসে আত্মবংশের পরিজনের কাছে প্রতিমুহূর্তে নিগৃহীত হয় সে। একদল উচ্ছৃঙ্খল শহরের যুবক, তারা জন্ম থেকেই বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত। পল্লীর অধ্যাবসায়ী কালীনাথ তাদের কাছে নিতান্ত কৌতুকের পাত্র। এই কৌতুক চরম পর্যায়ে পৌছায় কালীনাথের পঞ্চাশ টাকা চুরি যাওয়ার পর। কালীনাথের স্নায়ু এই অপমান সহ্য করতে পারে না এবং পরে যুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের মত তার মৃত্যু হয়। অনুশোচনায় শৈলেন ভবানীর সম্পত্তি পুনরায় ফিরিয়ে দিলেও রাসমণির কাছে তা এখন মূল্যহীন। সে ছিঁড়ে ফেলে দেয় সম্পত্তির উইল।মায়ের কাছে তার সন্তান সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। মাতৃস্নেহের সুন্দর ভাবনার কারণে গল্পটি শেষে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে।

বিশ শতকে নাগরিক সংস্কৃতি গ্রাস করে পল্লীজীবনকে। ইউরোপীয় আধুনিক দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহারের আতিশয্য এই সময়ের সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'পণরক্ষা' (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) গল্পে যেমন দেখি বাইসাইকেলের ব্যবহার—

> "এই সময়ে থানাগড়ের বাবুদের এক ছেলে এক বাইসিক্‌ল্ কিনিয়া আনিয়া চড়া অভ্যাস করিতেছিল। রসিক সেটাকে লইয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন আয়ত্ত করিয়া লইল যেন সে তাহার নিজেরই পায়ের তলাকার এক ডানা।"[৩৩]

গল্পের নায়ক রসিক এই বাইসাইকেল দেখে মুগ্ধ হয়। রসিকের বাইসাইকেল পাওয়ার পণ এবং সেই পণরক্ষার জন্য রসিকের দাদা বংশীর মৃত্যু এই গল্পের প্রধান বিষয় বস্তু। বংশী তাঁতি–

> "তাঁতে কাপড় বোনাই বংশীর পৈতৃক ব্যবসায়।"[৩৪]

দুই ভাই এর সংসার। বংশী বড় ভাই, ছোটভাই রসিক কে সে বড্ড ভালোবাসে। স্নেহের কাছে বড় পরাধীন সে। তাদের সমাজে কন্যাপণের প্রচলন ছিল; বরপক্ষ কে নির্দিষ্ট কন্যাপণ দিলে তবে পাত্রের বিবাহ হবে। বংশী নিজের বিবাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করতে না পারলেও ষোলো বছরের ছোটভাই এর জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রাণপাত করে। একদিকে বংশীর বংশ রক্ষার তাগিদ অন্যদিকে রসিকের বাইসাইকেল পাওয়ার জেদের দ্বন্দ্বে বংশী হয়েছে নিঃস্ব আর রসিক কলকাতায় পালিয়ে গেছে। পল্লীতে কন্যাপণের জন্য বিবাহ হয়না বংশীর অন্যদিকে শহরে জানকী বাবুরা অনেক টাকা বরপণ দিয়ে জাতে ওঠার চেষ্টা করে। মেয়ের বিবাহের জন্য পাত্র পছন্দ করে তাঁত ইস্কুলের শিক্ষক রসিককে।

> "শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল। অন্যান্য সকল প্রকার দান-সামগ্রীর আগে রসিক একটা বাইসিক্‌ল্ দাবি করিল।"[৩৫]

বিজয়ীর গর্বে গ্রামে ফিরে এলেও ফিরে পায়না স্নেহাশ্রয় দাদাকে। যে দাদা তাঁতের জন্য জীবন উৎসর্গ করেও রেখে গেছে ভাই এর জন্য বাইসাইকেল।

রবীন্দ্র ছোটগল্পে পল্লীজীবনের বাস্তবরূপের চিত্রণের পাশাপাশি নাগরিক জীবনের কদর্যতা প্রতিভাসিত হয়েছে। পল্লি-প্রকৃতির মনোরম ক্ষেত্রভূমিতে গ্রাম্য সরল মানুষের পাশাপাশি কুটিল-অবিশ্বাসী স্বার্থপর মানুষের সহাবস্থান। অন্যদিকে শহরের আধুনিক শিক্ষিত মানুষের ভাবনার সাথে উগ্র হিন্দুয়ত্ববাদী মানুষের দ্বন্দ্ব- সবই পূর্ণতা পেয়েছে রবীন্দ্র ছোটগল্পে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের, মানব কাহিনীর লেখক। মানব-দরদী লেখক সর্বদা মানুষের কাহিনী লিখেছেন। সেইজন্য কখনো হয়তো পল্লীজীবন আবার কখনো নাগরিক জীবন প্রেক্ষাপট হিসাবে ব্যবহার করেছেন। পল্লী-প্রকৃতির নির্ভেজাল রূপের সাথে ব্যক্ত হয়েছে গ্রাম্য দলাদলি-সংকীর্ণ-মনোবৃত্তি-গ্রামীণ রাজনীতির নগ্ন রূপ আবার কখনো শহরের জটিল জীবনের চক্রাবর্তে অঙ্কিত হয়েছে সহজ সরল মানব চরিত্র। পল্লীজীবন বনাম নাগরিক জীবনের দ্বন্দ্বে মানুষের রহস্যাবৃত জীবনগাথা বিরচন হয়েছে এই ছোটগল্প গুলির মাধ্যমে এবং দেশ-কালের গণ্ডীকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছেন যথার্থ মানব-শিল্পী।

তথ্যসুত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মহাকরণ, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৮০, পৃ. ৪৫৩
২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ কুড়ি বছর : ১৮৯১ – ২০১০), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০১৬, পৃ. ২৫
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড), সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১৬, পৃ. ১৪
৪. ঐ
৫. ঐ
৬. ঐ, পৃ.১৭
৭. ঐ, পৃ. ১৭
৮. ঐ, পৃ. ২৬
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড), সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১৬, পৃ. ২৭
১০. ঐ, পৃ. ২৮
১১. ঐ, পৃ. ২৯
১২. ঐ, পৃ. ৩১
১৩. ঐ, পৃ. ৩২

১৪. ঐ, পৃ. ৩৩
১৫. ঐ, পৃ. ৬৩
১৬. ঐ, পৃ. ৬৪
১৭. ঐ, পৃ. ৬৫
১৮. ঐ, পৃ. ৬৬
১৯. ঐ, পৃ. ১০২
২০. ঐ, পৃ. ১০৭
২১. ঐ, পৃ. ১০৪
২২. ঐ, পৃ. ১১০
২৩. ঐ, পৃ. ১৭২
২৪. ঐ, পৃ. ১৮৪
২৫. ঐ, পৃ. ১৮৭
২৬. ঐ, পৃ. ১৮৯
২৭. ঐ, পৃ. ৩১৩
২৮. ঐ, পৃ. ৩১৪
২৯. ঐ, পৃ. ৩৩৬
৩০. ঐ, পৃ. ৩৩৮
৩১. ঐ, পৃ. ৪৫৬
৩২. ঐ, পৃ. ৪৫৭
৩৩. ঐ, পৃ. ৪৮১
৩৪. ঐ, পৃ. ৪৭৭
৩৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড), সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১৬, পৃ. ৪৮৯

সহায়ক গ্রন্থ :

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা (বাংলা ছোটগল্পের একশ কুড়ি বছর : ১৮৯১-২০১০), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০১৬
২. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসং, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, নভেম্বর, ২০২১
৩. ক্ষেত্র গুপ্ত, রবীন্দ্র-গল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অগাস্ট, ১৯৮৪
৪. তপোব্রত ঘোষ, রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ, অগাস্ট, ২০০১
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পগুচ্ছ [অখণ্ড], সত্যনারায়ণ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ (কলকাতা বইমেলা), জানুয়ারি, ২০০২